জাদুবাস্তবতার তত্ত্বভাবনা ও বাংলা সাহিত্য

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া
ইমেল : kc4u2013@gmail.com

১৯৩০-এর দশক থেকে 'সুররিয়ালিজম'-এর আন্দোলনে যুক্ত কিউবার ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ার ১৯৪৯-এ তাঁর 'On the Marvelous Real in America' প্রবন্ধে লাতিন আমেরিকা ও তার সাহিত্য প্রসঙ্গে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'After all – what is the entire history of America if not a chronicle of the marvelous real?' এই 'marvelous real' হলো বাস্তবতার এক ভিন্নতর রূপ, ইওরোপীয় বাস্তববাদের সীমার বাইরে এক প্রতিস্পর্ধী বাস্তবতার বয়ান যা এক অ-রৈখিক ও বিকল্প বাস্তবের যাপনচিত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলো। এই ম্যাজিক বা মার্ভেলাস রিয়ালিজম বাস্তব ও কুহক কল্পনার এক আশ্চর্য মিশ্রণ, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব-নির্ভর আখ্যানের ভিতরে অবিশ্বাস্য অধিবাস্তব ঘটনার উপস্থিতি, স্বপ্ন-রূপকথা-পুরাণ- লোকগাথা ইত্যাদির ঐন্দ্রজালিক উপস্থাপন। অভিধার জন্ম ইওরোপে হলেও সাহিত্য-ভাবনা তথা শৈলি হিসেবে 'magic realism'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো লাতিন আমেরিকায়। ক্রমে বিশ্বের নানা ভাষার সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্বে যেখানেই ঔপনিবেশিকতার ক্লেদাক্ত পদচিহ্ন পড়েছে সেখানেই উপনিবেশবাদী সংস্কৃতির প্রতিস্পর্ধায় সময়ান্তরে সৃষ্টি হয়েছে ম্যাজিক রিয়ালিজমের পোস্টকলোনিয়াল ডিসকোর্স। বর্তমান প্রবন্ধ সেই জাদুবাস্তবতার জন্মকথা এবং লাতিন আমেরিকার কিংবদন্তী লেখক মার্কেজের 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর' ও অন্যান্য রচনার সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যে এই তত্ত্বভাবনা তথা আঙ্গিকের আবির্ভাব ও বহুমাত্রিক প্রয়োগের একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের প্রয়াস মাত্র।

চাবি-শব্দ : জাদু, জাদুবাস্তব, কুহক, ঐন্দ্রজালিক, প্রতিস্পর্ধী

জাদুবাস্তবতা : জন্মকথার নেপথ্যে

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইওরোপীয় সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রিয়ালিজম-এর তত্ত্ব ও আঙ্গিক। এই বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের অঙ্গিকার ছিল বিশ্বস্ততার সঙ্গে জীবন ও সমাজের বাস্তবচিত্রের পরিবেশন। গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর প্রথম উপন্যাস মাদাম বোভারী-কে প্রথম বাস্তবতাবাদী উপন্যাস বলে মনে করা হয়ে থাকে। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকে ফরাসী চিত্রশিল্পী ক্লদ মনে, পল সেজান, ক্যামিল পিসারো, এদুয়ার মনে প্রমুখের রং-তুলিতে জন্মলাভ করেছিল ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা। বাস্তববাদী আন্দোলনের পরিণতিতেই এসেছিল ইমপ্রেশনিজম, যাকে বলা যায় এক অতিবাস্তবাদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে সূচনা হলো বাস্তবতাবাদের প্রতিস্পর্ধী এক নান্দনিকতার, অভিব্যক্তিবাদ বা Expressionism-এর, যার আগ্রহ ছিল 'সাহিত্যে ও চিত্রকলায় বাহ্যিক জীবনের অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ জীবনের মর্মোদ্ঘাটনে'। কিংবদন্তী চিত্রকর ভান গঘ ও নরওয়ের চিত্রশিল্পী

এডভার্ড মুঙ্ক ছিলেন এই অভিব্যক্তিবাদের পথিকৃৎ। ১৯১০ থেকে ১৯২৫ জার্মানি ও ইওরোপের অন্যত্র চিত্রকলা, নাটক ও চলচ্চিত্রে বাস্তববাদী আঙ্গিকে বীতরাগ এবং রোমান্টিকতার আঙ্গিকে অতৃপ্ত এই অভিব্যক্তিবাদী প্রস্থান শিল্পীর অন্তরের উপলব্বিকে অবাধে ব্যক্ত করতে চাইছিল আবেগ-অনুভব-স্বপ্নের ফ্রেমে, রূপক-প্রতীক-ফ্যানটাসির ব্যবহারে। জার্মান দার্শনিক বের্গসঁ ও আধুনিক মনঃসমীক্ষণের জনক ফ্রয়েডের অবচেতন ও স্বপ্নতত্ত্বের বিশেষ যোগদান ছিল Expressionism-এর ভাবনা ও প্রয়োগে। জার্মান নাট্য-আন্দোলনে প্রতিবাদী চেতনার নতুন আঙ্গিক হিসেবে অভিব্যক্তিবাদের প্রয়োগ করেছিলেন Georg Kaiser ও Ernst Toller এবং এরই পরিণতিতে দেখা দিয়েছিল ব্রেখটের 'এপিক থিয়েটার'। আমেরিকায় অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিলো ইউজিন ও'নীলের নাটকে। কাফকার জটিল, দুঃস্বপ্নতাড়িত আখ্যানে, আধুনিকতাবাদী জয়েসের চৈতন্যপ্রবাহী ইউলিসিস-এ এবং এলিয়টের রূপক-কাব্য দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-এ এই প্রকাশবাদী মন্ময়তার আঙ্গিক লক্ষ করা গিয়েছিল।

১৯১৫ সালে জুরিখে ফরাসী- রোমানীয় আভঁ গার্দ কবি ত্রিস্তান জারা ও তাঁর সঙ্গী জার্মান লেখক হুগো বল সূচনা করেছিলেন বুর্জোয়া শিল্প-সংস্কৃতি বিরোধী এক নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন যা 'ডাডাবাদ' নামে পরিচিত। প্রথাগত জীবনযাত্রা, ধর্মচেতনা, নীতি ও সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি সবকিছু ভেঙেচুরে ফেলাই ছিল ডাডাবাদীদের লক্ষ্য। ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ প্যারিসের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার নিউ ইয়র্কেও ডুক্যাম্প, ম্যানরে প্রমুখ ডাডাবাদী শিল্পীরা সক্রিয় ছিলেন। ১৯২০-তে দুটি গোষ্ঠী মিলে গিয়ে প্যারিসকেই ডাডাবাদীরা করে তোলেন তাঁদের চর্চাকেন্দ্র। ডাডাবাদের সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য কবি-লেখকদের মধ্যে ছিলেন আঁদ্রে ব্রেঁত, লুই আরাগঁ ও পল এলুয়ার।

১৯২২-এ ডাডাবাদ স্তিমিত হয়ে পড়লে দুই ডাডাবাদী, ব্রেতঁ ও আরাগঁ শুরু করেছিলেন পরাবাস্তবতার আন্দোলন 'সুররিয়ালিজম'। ১৯২৪-এ ব্রেতঁ প্রকাশ করেছিলেন প্রথম সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো। ১৯১৭ সালে কবি গীয়ম আপোলোনিয়ের 'surialiste' শব্দটি ব্যবহার করেন বাস্তবের সীমা অতিক্রমণের প্রয়াস বোঝাতে। যুক্তিশাসিত প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সীমা পেরিয়ে মগ্নচেতনার যে এক অধি/পরা-বাস্তব জগৎ রয়েছে তার গভীর রহস্যকে উদ্ঘাটন করাই ছিল সুররিয়ালিস্ট চিত্রকলা, কবিতা ও চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য। মনস্তত্ত্বের ছাত্র ব্রেতঁ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের তত্ত্বকে শিল্প-সাহিত্যে প্রয়োগের পরীক্ষায় নেমেছিলেন। ফ্রয়েডের স্বপ্ন-মনস্তত্ত্ব ও অবচেতনের ধারণা ছিল সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রচলিত বিরোধিতা নাকচ করে সুররিয়ালিস্টরা বললেন এক উচ্চতর বাস্তবের কথা যেখানে চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন ইত্যাদি সব মিলেমিশে যায়। ডাডাবাদে যে বিপ্লবীয়ানার সূত্রপাত হয়েছিল, 'সুররিয়ালিজম' তাকে বিস্তৃতি দিয়েছিল চিত্রকলা ও সাহিত্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পেরিয়ে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত।

এরই মধ্যে ১৯২৫ সালে জার্মান শিল্প-সমালোচক Franz Roh তাঁর একটি গ্রন্থনামে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' অভিধাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিন চিত্রশিল্পী Max Beckmann, George Grosz ও Otto Dix আয়োজিত প্রদর্শনীর আলোচনায় Roh ব্যবহার করেন 'Magischer Realismus' শব্দবন্ধটি যার আপাতদৃষ্ট বৈপরীত্যে নিহিত ছিল এক ব্যতিক্রমী জীবনদৃষ্টি তথা সাহিত্যতত্ত্বের অঙ্কুর যার বীজের সন্ধান করেছি আমরা ইমপ্রেশনইজম থেকে একসপ্রেশনইজম, ডাডাইজম থেকে সুররিয়ালিজমের নানা গোত্রের অতি/অধি/পরা-বাস্তবতায়।

উদ্ভব, স্বরূপ ও বিস্তার

১৯৩০-এর দশক থেকে 'সুররিয়ালিজম'-এর আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন কিউবার ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ার। ১৯৪৯-এ তিনি তাঁর 'On the Marvelous Real in America' প্রবন্ধে লাতিন আমেরিকা ও তার সাহিত্য প্রসঙ্গে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'After all– what is the entire history of America if not a chronicle of the marvelous real?' তিনি আরো বলেন যে এই 'marvelous real' হলো বাস্তবতার এক ভিন্নতর রূপ, ইউরোপীয় বাস্তববাদের সীমার বাইরে এক প্রতিস্পর্ধী বাস্তবতার বয়ান যা এক অ-রৈখিক বাস্তবের যাপনচিত্র তুলে ধরতে পারবে। এই ম্যাজিক বা মার্ভেলাস রিয়ালিজম বাস্তব ও কুহক কল্পনার এক আশ্চর্য মিশ্রণ, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব-নির্ভর আখ্যানের ভিতরে অবিশ্বাস্য অধিবাস্তব ঘটনার উপস্থিতি, স্বপ্ন-রূপকথা-পুরাণ-লোকগাথা ইত্যাদির ঐন্দ্রজালিক উপস্থাপন। কোনো কোনো মুহূর্তে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে যেন আখ্যান চলে যাচ্ছে খেয়ালিপনা ও উদ্ভট কল্পনার জগতে। ম্যাজিক এখানে বাস্তবকে বদলাতে চায়। কুমকুম সাঙ্গারি তাঁর 'The Politics of the Possible'-এ লিখেছেন—'marvellous realism must exceed mimetic reflection in order to become an interrogative mode that can press upon the real at the point of maximum contradiction.'

JOCAS
Journal of Commerce, Arts and Science
Volume: 4, Issue : 1, December 2021

অভিধার জন্ম ইওরোপে হলেও সাহিত্য-ভাবনা তথা শৈলি হিসেবে 'magic realism'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো লাতিন আমেরিকায়। কেন লাতিন আমেরিকাতে জন্ম নিয়েছিলো ম্যাজিক রিয়ালিস্ট সাহিত্য? প্রথমত, স্পেনের অধীনে ১৫৯২ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ২২৭ বছরে লাতিন আমেরিকা ঔপনিবেশিক কদর্যতার এক প্রশস্ত লীলাভূমি হয়ে উঠেছিলো। দারিদ্র, সংকীর্ণতা, স্বেচ্ছাচার, ঘিঞ্জি বস্তি, দেহব্যবসা ইত্যাদিতে আকীর্ণ জনপদগুলির মানুষেরা হয়ে পড়েছিলো স্মৃতিহীন, অস্তিত্বহীন, অনিশ্চিত জীবনে গ্রস্ত। ইউরোপীয় সভ্যতা তাদের যাবতীয় মর্যাদা কেড়ে নিয়ে উপহার দিয়েছিলো লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র রাস্তা ছিলো প্রতিবাদ-শানিত বিদ্রূপ। দ্বিতীয়ত, লাতিন আমেরিকা হয়ে উঠেছিলো স্পেনীয়, আন্দুলিসিয়, রেডইন্ডিয়ান, আফ্রিকান ইত্যাদি একাধিক প্রাচীন জাতি-উপজাতির মানুষের যাপনক্ষেত্র। ক্রীতদাস হিসেবে বা পেটের দায়ে আসা এইসব মানুষদের সঙ্গে এসেছিলো তাদের স্বতন্ত্র অতিকথা, উপকথা, কল্পকাহিনী, ধর্মীয় বিশ্বাস ও বহুবর্ণময় আশ্চর্য সব রূপকথা, যেগুলি দিয়েছিলো সমাজ ও রাজনীতির অত্যাচার-অনাচার-উৎকেন্দ্রিকতাকে তুলে ধরার এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি তথা আঙ্গিক। ম্যাজিক রিয়ালিস্ট লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য গার্সিয়া মার্কেজ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমরা বাস্তবের সাথে বোঝাপড়া করতে স্বভাবতই অনেক অবাস্তবতার হাত ধরি, যাদু, প্রটেম, টেলিপ্যাথি, প্রিমোনিশন্স, অনেক অনেক অন্ধবিশ্বাস আর অদ্ভুতুড়ে ভাবনার। এভাবে কাল্পনিক পদ্ধতিতে বাস্তবের মোকাবিলা করার ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক বোধ হয়।' মার্কেজ আরো বলেছিলেন, 'আমাদের রিয়ালিটি আলাদা। আমরা জাদুতে বিশ্বাস করি, প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে দেখি। তাতে আপনাদের কী? সব সময় আপনাদের ওই ইউরোপীয় যুক্তিবাদের অঙ্ক দিয়ে ভাবতে হবে না কি?' কার্পেন্তিয়ার ১৯৪৯-এ প্রকাশিত El reino de este mundo (The Kingdom of this World) উপন্যাসের মুখবন্ধে ব্যবহার করেছিলেন 'lo real maravilloso americano' (the real marvelous American) শব্দবন্ধটি, লাতিন আমেরিকার অতিলৌকিকতার কুহকমণ্ডিত ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক জীবনবাস্তবকে বোঝাতে।

ক্রমে বিশ্বের নানা ভাষার সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা বিস্তার লাভ করেছে কারণ ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়নের ক্লেদ ও পণ্যায়নের অর্থনীতি-রাজনীতি শুধু লাতিন আমেরিকাকেই বঞ্চনার পাঁকে নিমজ্জিত করে নি। বিশ্বে যেখানেই ঔপনিবেশিকতার ক্লেদাক্ত পদচিহ্ন পড়েছে সেখানেই উপনিবেশবাদী সংস্কৃতির প্রতিস্পর্ধায় সময়ান্তরে সৃষ্টি হয়েছে ম্যাজিক রিয়ালিজমের পোস্টকলোনিয়াল ডিসকোর্স। নিছক বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতাকে অতিক্রম করে, রূপকথা, অতিকথা, লোকগাথা ইত্যাদিকে আশ্রয় করে জাদুবাস্তবতা নানাভাবে সামাজিক-মানবিক দায় ও মূল্যকে তুলে ধরতে চেয়েছে। উত্তর-উপনিবেশবাদী ডিসকোর্স হিসেবে ম্যাজিক রিয়ালিজমের চর্চা বিশেষ বিস্তার লাভ করে ১৯৬৭ সালে কলম্বিয়ার লেখক গার্সিয়া মার্কেজের One Hundred Years of Solitude প্রকাশিত হওয়ার পর। এই রীতির অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেযোগ্য কিউবার লেখক কার্পেন্তিয়ার, আরজেনটিনার বর্হেস, চেক লেখক মিলান কুন্দেরা, জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস, ব্রাজিলের পাওলো কোয়েলো, ভারতীয় ইংরেজ লেখক সালমন রুশদি, তুরস্কের ওরহান পামুক প্রমুখ। নানা দেশ নানা ভাষার নানা লেখক নানা মাত্রায় 'ম্যাজিক রিয়ালিজম'- কে করে তুলেছেন তাঁদের জীবনদৃষ্টি, প্রকরণ ও প্রতিবাদী লিখন-কৌশল।

J. A. Cuddon তাঁর Dictionary of Literary Terms and Literary Theory - তে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম'-এর যে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন সেগুলি এইরকম—
ক) বাস্তব, ফ্যানটাসি, উদ্ভটের মিশ্রণ বা সহাবস্থান; খ) চকিত সময় বদলের নৈপুণ্য; গ) ন্যারেটিভ বা প্লটের বিভিন্ন অংশ একত্রে পাকানো বা গোলকধাঁধার প্লট; ঘ) স্বপ্ন-মিথ-রূপকথার ব্যবহার; ঙ) প্রকাশবাদী ও পরাবাস্তববাদী বর্ণনা; চ) রহস্যময় পাণ্ডিত্য; ছ) সহসা চমকসৃষ্টির উপাদান; জ) আতঙ্কময় ও অব্যাখ্যেয়-র উপস্থিতি।

'নিঃসঙ্গতার একশ বছর' এবং 'কলেরার মরশুমে প্রেম' সহ সাতটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস এবং বেশ কিছু ছোটগল্প ও অন্যান্য গদ্যের রচয়িতা নোবেলজয়ী কলম্বিয়ান লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ জাদুবাস্তবতার জনকপ্রতিম রূপকার বলে স্বীকৃত। ১৯৮২-তে নোবেল কমিটির মন্তব্যে বলা হয়েছিলো যে মার্কেজ নির্মাণ করেছেন 'a cosmos in which the human heart and the combined forces of history, time and again, burst the bounds of chaos.' এই মন্তব্যের আলোকে আমাদের বুঝতে হবে কিভাবে প্রেম-নিঃসঙ্গতা-মৃত্যুর আশ্চর্য বয়ান নির্মাণে মার্কেজ মিলিয়ে দিয়েছেন যাপিত বাস্তব ও পরাবাস্তবতাকে, হৃদয়বৃত্তি ও সময় তথা ইতিহাস চেতনাকে, জীবনের তুচ্ছ ও সরল অভিজ্ঞতার সঙ্গে অতিকথা আর কল্পনাকে। অবশ্য কল্পনার যে কুহকমায়ার জন্য মার্কেজ বিশ্ববন্দিত তাকে তিনি অবাস্তব বা অতিবাস্তব বলে স্বীকার করেন নি, বরং ক্যারিবীয় বাস্তবতার প্রতীয়মান বৈশিষ্ট্য বলেই চিহ্নিত করেছেন।

মার্কেজের জনপ্রিয়তম এপিক আখ্যান One Hundred Years of Solitude পঁয়ত্রিশটিরও বেশি ভাষায় তর্জমা হয়েছে এবং বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটিরও বেশি, যে বইকে আর এক স্বনামধন্য নোবেলজয়ী, চিলির কবি পাবলো নেরুদা, অভিহিত করেছেন 'the greatest revelation in the Spanish language since the Don Quixote of Cervantes' বলে। কলম্বিয়ার ক্যারিবীয় উপকূলের আরকাতাকা গ্রাম যেখানে ১৯২৭-এ জন্মেছিলেন লাতিন আমেরিকার সর্বজনপ্রিয় 'গাবো', মার্কেজের আখ্যানে সেই আরকাতাকাই যেন জাদুবাস্তবের অলীক আরশিনগর 'মাকোন্দো'। পাঁচ দশক ধরে মার্কেজ ছিলেন মাকোন্দোর মত আশ্চর্য ঐশ্বর্যশালী লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের পিতৃপ্রতিম বুয়েন্দিয়া। তার মানুষদের স্মৃতি-আবেগ-বিশ্বাস-কল্পনা-কুসংস্কার-ব্যর্থতা-বেদনা-হিংসা-প্রেম-উপকথা-রূপকথা ইত্যাদি সবকিছুর অভিনব ইতিবৃত্তকার। মার্কেজের জাদুবাস্তবতার আদ্যাপীঠ মাকোন্দো আত্মপ্রকাশ করেছিলো তাঁর প্রথম নভেলা 'পাতার ঝড়' বা Leaf Storm (১৯৭২)-এ, মূল যে রচনাটি La Hojarasca নামে বেরিয়েছিল ১৯৫৫ সালে। সদ্য গৃহযুদ্ধ-তাড়িত জনপদ মাকোন্দোর এক নিঃসঙ্গ আত্মঘাতী ডাক্তারের যথাযথ অন্ত্যেষ্টি দিতে উদ্যোগী এক বৃদ্ধ কর্নেল, কর্নেলের মেয়ে ইসাবেল ও ইসাবেলের ছেলেকে নিয়ে, বহুস্বর কথনরীতি ও চৈতন্যপ্রবাহের আঙ্গিকে, নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুর এই আখ্যান। একটি দিনের মাত্র আধ ঘন্টার সময়সীমায় একটি ঘরের সীমাবদ্ধ পরিসরে এই আখ্যান গড়ে উঠেছিলো বয়ানের বহুমাত্রিকতা ও কালিক বিপর্যাসের জাদুবাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্যে।

One Hundred Years of Solitude একশ' বছরের সময়সীমায় লোকালয়-বিচ্ছিন্ন জনপদ মাকোন্দোয় বুয়েনদিয়া পরিবারের সাত প্রজন্মের কাহিনি, নিঃসঙ্গতায় যার শুরু এবং নিঃসঙ্গতায় শেষ। নদী-তীরে গড়ে ওঠা অলীক জনপদ মাকোন্দোর প্রতিষ্ঠাতা হোসে আরকাদিও বুয়েনদিয়া যে তার স্ত্রী উরসুলাকে নিয়ে কলম্বিয়া থেকে চলে এসেছিল হোসে আরকাদিওকে নির্বীর্য অপবাদ দেওয়া জনৈক প্রুডেনসিওকে হত্যা করে। তার স্বপ্নে দেখা মাকোন্দো পত্তন করেছিল, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন যে জনপদ বহু বছর ধরে হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য নানা ঘটনার এক ইউটোপিয়া। ফি বছর সেখানে আসতো একদল জিপসী, ম্যাজিক দেখাতো; দেখাতো চুম্বক, দূরবীণ, বরফের মতো বিজ্ঞানের নানা বিস্ময়। জিপসীদের একজন, প্রাজ্ঞ মেলকিয়াদেস-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় হোসে আরকাদিওর। সে জিপসীদের দেখানো নানা রহস্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠে, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চায়। উরসুলা কোথাও যাবে না কারণ এখানেই সে একটি ছেলে পেয়েছে। মাকোন্দোয় তখনও কেউ মারা যায় নি বলে কোনো সমাধিক্ষেত্রও নেই। কেবলই লাতিন ভাষায় কথা বলতে থাকা প্রায়োন্মাদ হোসে আরকাদিওকে তার পরিবারের লোকেরা একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে অনেক বছর। মৃত্যু হয় তার। তার বড় ছেলে হোসে বাবার মতো বলশালী ও আবেগপ্রবণ, আর ছোট ছেলে আউরেলিয়ানো বাবার মতো রহস্যসন্ধানী। উরসুলা তার হারানো বড় ছেলেকে খুঁজে ফিরে আসার সময় নিয়ে আসে একদল বিদেশিকে যারা বিক্রি করতে শুরু করে নানা পশরা। শুরু হয়ে যায় মাকোন্দোর সঙ্গে বিদেশিদের যোগাযোগ।

মাকোন্দো ক্রমে হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় বাণিজ্যকেন্দ্র, যেখানে আসে ইয়াঙ্কিরা, কলাখামারের মুনাফার সুযোগে ফুলেফেঁপে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আধিপত্যে মাকোন্দো বদলে যায়, এসে যায় ট্রেন, বিদ্যুৎ, মদ, খাবার, দেহপসারিনি। শ্রমিকরা ধন উৎপাদন করলেও পড়ে থাকে নিচুতলায়, কলাকারবারীদের সুরম্য অট্টালিকা থেকে দূরে। বোয়েনদিয়া পরিবারের সঙ্গে বিদেশি শ্বেতাঙ্গদের সখ্য গড়ে ওঠে, উৎসব আর আনাগোনা চলতে থাকে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় মাকোন্দোয়। আউরেলিয়ানো বুয়েনদিয়া হয়ে ওঠে এই গৃহযুদ্ধের এক বিদ্রোহী নায়ক কর্নেল আউরেলিয়ানো। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ-পর্বের হত্যা-হিংসা-সরকার পরিবর্তনের শেষে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র আকার নেয় কলম্বিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে ধর্মঘটী কলাখামারের শ্রমিকদের নির্বিচার গণহত্যায়। প্রবল বৃষ্টি নামে মাকোন্দোয়, অবিরাম বর্ষণ চলে প্রায় পাঁচ বছর। অজাচার ও ব্যভিচারে একে একে মৃত্যু হতে থাকে বুয়েনদিয়া পরিবারের সদস্যদের। আউরেলিয়ানো বাবিলোনিয়া উদ্দাম কামনায় অজাচারে লিপ্ত হয় মাসি আমারান্তা উরসুলার সঙ্গে। তাদের শুয়োরের লেজ নিয়ে জন্মানো সন্তান মারা যায়, বাঁচে না তার মা'ও। একা বন্ধ ঘরে আটকে পড়ে আউরেলিয়ানো বাবিলোনিয়া। আর এইসময়ই ভয়ানক ধুলিঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায় মাকোন্দো। উল্লম্ব সময় আর আনুভূমিক বাস্তবের কৌণিকতায় গড়ে উঠেছে জাদুবাস্তবতার এই এপিক আখ্যান, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের অগুনতি চরিত্র-ঘটনা, লৌকিক-অলৌকিক-উদ্ভটের আশ্চর্য নন-লিনিয়ার বয়নের অবিশ্বাস্য বিশ্বস্ততায়।

১৯৫৮ সালে সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত মার্কেজ তাঁর বন্ধুদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এক স্বৈরশাসককে নিয়ে একটা বই লেখার ইচ্ছা। তাঁর নিজের দেশে একনায়কতন্ত্রী শাসক গুস্তাভো রোহাস্ পিনাইয়ার স্বৈরশমনে 'এল্ এসপেক্তাদোর' বন্ধ হয়ে

JOCAS
Journal of Commerce, Arts and Science
Volume: 4, Issue : 1, December 2021

গেলে 'গাবো' তখন কলম্বিয়া ছেড়ে ইওরোপে। দেখেছিলেন আর এক স্বৈরশাসক, ভেনিজুয়েলার মার্কোজ পেরেজ জিমেনেজের পতন। তারও অনেক আগে ইতিহাস লাঞ্ছিত হয়েছিল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অপকীর্তিতে। ১৯৬৮-তে মার্কেজ লিখতে শুরু করলেন El otono del patriarca / The Autumn of the Patriarch, এক আর্কিটাইপ্যাল স্বৈরশাসকের ক্ষমতার ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার ম্যাজিক-রিয়ালিস্ট আখ্যান, যে শাসক বেচে দেয় সমুদ্র, বেচে দেয় হৃদপিণ্ড ও রক্তকে টুকরো করে আমেরিকাকে। লম্বা প্যারাগ্রাফে, তিন-চার পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ বাক্যে, সময়ের অনুক্রম ভাঙা ও পাল্টে পাল্টে যাওয়া কথনভঙ্গির এক কাব্যগুণান্বিত গদ্যে মার্কেজ নির্মাণ করেছিলেন এক তীব্র পলেমিক, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিকারগ্রস্ত নিঃসঙ্গতার এক রূপকবৃত্তান্ত।

১৯৮১ থেকে মেক্সিকো ছিলো মার্কেজের স্থায়ী ঠিকানা। ঐ বছরই বেরিয়েছিলো তাঁর সাংবাদিকতাধর্মী নভেলা 'Chronicle of a Death Foretold'। সত্য ঘটনা অবলম্বনে 'অনার কিলিং'-এর এক নন-লিনিয়ার ন্যারেটিভ। শেষ থেকে শুরুতে চলা প্লটের উজানী প্রবাহে ঘটনা ও কল্পনার বিভ্রান্তিকর মিশেলে জাদুবাস্তবতার স্পর্শ টের পাওয়া যায়। ছোটবেলায় দিদার কাছে শুনেছিলেন বারো বছরের এক জাদুবালিকার গল্প, যার মাথার তামাটে চুল বেড়ে যাচ্ছিলো মৃত্যুর পরেও। 'Of Love and Other Demons' ছিলো সেই অলীক বাস্তবের কাহিনি।

একশ বছরের নিঃসঙ্গতার ঐন্দ্রজালিক ভাষ্যকার চলে যেতে চেয়েছিলেন রৈখিক ও বস্তুযুক্তি-নির্ভর বাস্তবতার প্রতিস্পর্ধায় এক চিরজায়মান মাকোন্দোর দিকে। আমাদের জন্য রেখে যেতে চেয়েছিলেন এক দূর-সম্ভাবনার হাতছানি—'A new and sweeping utopia of life, where no one will be able to decide for others how they die, where love will prove true and happiness be possible, and where the races condemned to one hundred years of solitude will have, at last and forever, a second opportunity on earth'.

বাংলা সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা : একটি কুণ্ঠিত অবতরণিকা

ইওরোপীয় সভ্যতা যেমন গড়েছে অনেক, ভেঙেছেও অনেক কিছু। সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের হিংসা-রক্তপাত-অত্যাচারের কাহিনি চাপা দিতে চেয়েছে উপরিতলের রুচিশীলতার আড়ালে। লাতিন আমেরিকার মানুষ ইওরোপের সেই বর্বরতা ভোলেনি। তাই তাদের উদ্ভাবিত সাহিত্যরীতি magic realism মূলত ইওরোপীয় ডিসকোর্সের বিরোধিতায় এবং স্বদেশের স্বার্থে নতুন জনদরদী সরকার গড়ার স্বপ্নভঙ্গের জ্বালায় এক শ্লেষাত্মক রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধা। বাংলা সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে ঔপনিবেশিক বাংলাও প্রত্যক্ষ করেছে সাগরপারের সাদা চামড়ার প্রভুদের অত্যাচার ও আধিপত্য, ভোগ করেছে তাদের ছেড়ে যাওয়া ঔপনিবেশিক আবর্জনা, যা যুগ যুগান্তরে সংক্রমিত করেছে অস্তিত্বহীনতা ও স্মৃতিহীনতার অভিশাপ, যার সাথে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই জড়িত।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভট রসের উপন্যাস 'কঙ্কাবতী' বাংলা সাহিত্যে প্রথম জাদু ও বাস্তবতার মিশ্রণের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দুটি পর্বের এ-কাহিনির প্রথম পর্বে প্রকৃত ঘটনা ও বাস্তবের জগৎ আর দ্বিতীয় পর্বে অসম্ভব উদ্ভটত্বের জগৎ। এই লেখার প্রশংসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাদুবাস্তবের মূল সুরটি ছুঁয়েছিলেন; 'লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই।' প্রচলিত রূপকথার পুনর্নির্মিত এই আখ্যানে পিতৃতান্ত্রিক বঙ্গসমাজে পীড়িতা কঙ্কাবতী তার স্বপ্নে দেখা এক সমান্তরাল রাস্তা খোঁজে বেঁচে থাকার। বাস্তব বিপদের রূপ ধরে আসে নাকেশ্বরী রাক্ষসী, ভুত-প্রেত, কথা বলে পশুপাখির দল। কঙ্কাবতীর গল্প তো এক স্বপ্নই আর তাই জাদুবাস্তবের 'dream-like element' হিসেবে আসে রূপকথা, উপকথা, রাক্ষস-খোক্ষস, শিকড়ের গুণে বাঘ হয়ে যাওয়া মানুষ। লৌকিক-অতিলৌকিক-অলৌকিক, স্বপ্ন-বাস্তব-আজগুবির বেড়াভাঙার খেলায় লাতিন-আমেরিকান ম্যাজিক রিয়ালিজমের সঙ্গে তুলনীয় জাদু ও বাস্তবের এক মিশ্র সংস্করণ পেশ করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর 'লুল্লু' আর 'ডমরুচরিত'-এর গল্পগুলিতেও।

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কৃৎকৌশলের বিপরীতে দেশজ সংহিতায় এই যে প্রতিরোধী আয়ুধ নির্মাণ করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ, পরবর্তীতে তাকে গ্রহণের আগ্রহ দেখান নি বাংলা ভাষার লেখকরা। অসামান্য দার্শনিক বোধসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ এবং দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কলমে জমিদারতন্ত্র ও সাধারণ জীবনের কথা থাকলেও দেশজ পরম্পরা নির্ভর কোনো প্রতিবাদী

বয়ান ছিল না, ছিল না প্রান্তিক জীবনের অতীত ঐতিহ্য তথা মিথ-পুরাণের ঐন্দ্রজালিক উপস্থিতি। ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত ও তার ফলশ্রুতিতে প্রান্তিক জীবনের কোনো প্রতিবাদী গ্রন্থনা বিভূতিভূষণেও নজরে আসে নি। তারাশঙ্করের 'হাসুলিবাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'- তে ব্রাত্যজীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতির কথা থাকলেও বাস্তবের রুক্ষতা অতিক্রম করতে সেই লোকায়ত ব্যবহৃত হয় নি। বাস্তববাদী মানিক বন্দোপাধ্যায় কোথাও কোথাও পরাবাস্তবতা ও কল্পবাস্তবতার আঙ্গিক ব্যবহার করে থাকলেও প্রতিবাদী আয়ুধ রূপে তিনি মিথ-পুরাণ-স্বপ্ন-স্মৃতিকে ব্যবহার করেন নি। কল্লোলীয় বাস্তবতার আধুনিকতায় বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের অভাব না থাকলেও ঔপনিবেশিকতার প্রতিস্পর্ধায় দেশীয় ঐতিহ্য ও কল্পনার তেমন কোনো সূত্র নজরে আসে নি। তিরিশের শুরুতে 'কারুবাসনা' ও চল্লিশের শেষে 'জলপাইহাটি'-তে জীবনানন্দ বাস্তব আর পরাবাস্তবের একটা সীমানা নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন।

পঞ্চাশের দশক ও তার পরবর্তীতে বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা সম্পন্ন লোকজীবনের বাস্তবতা আমরা পাইনি এমন নয়। তবে বাস্তবতার সীমা পেরিয়ে জাদুবাস্তবের পরিসরে উত্তরণ তেমন লক্ষ করা যায় নি। রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশীর পদাবলী', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' ইত্যাদিতে ব্রাত্যজীবন ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার চিত্র থাকলেও জাদুবাস্তবতার প্রতিরোধী আঙ্গিক সেভাবে দেখা যায় নি। এরও পরে 'মহিষকুড়ার উপকথা' ও 'চাঁদবেনে'-তে অমিয়ভূষণ সচেতন প্রয়াসে নিজেকে বাস্তবতার নিগড় থেকে লোককথার পুনর্নির্মাণে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এরই মধ্যে ষাটের দশকে 'হাংরিয়ালিস্ট'দের বিদ্রোহী প্রক্ষোভ থেকে জন্ম নিয়েছিল জাদুবাস্তবতার এক প্রারম্ভিক রূপ, মলয় ও সমীর রায়চৌধুরী এবং বাসুদেব দাশগুপ্ত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে, যাঁরা এক inverted reality কে জাদুর মিশ্রণে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতায় পরিণত করতে চাইলেন। ইতিমধ্যে মার্কেজ লিখলেন One Hundred Years of Solitude এবং ঐ বছরই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'কুবেরের বিষয় আশয়'। ১৯৮১-তে লেখা হয়েছিল রুশদি'র Midnight's Children। দুই বাংলার গল্প-উপন্যাসে ম্যাজিক রিয়ালিজম-এর কোটাল এল ১৯৮২-তে মার্কেজের নোবেলপ্রাপ্তির উত্তরকালে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) প্রথম বাংলা ম্যাজিক রিয়ালিস্ট উপন্যাসের স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। একই বছরে প্রকাশিত One Hundred Years of Solitude-এর লেখক মার্কেজের সাম্রাজ্যবাদ-প্রতিরোধী বয়ান এখানে না থাকলেও, শহর থেকে দূরে কদমপুর গ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা দারিদ্র-পীড়িত গ্রামজীবন, জমি ঘিরে কুবেরের স্বপ্ন, মেদনমল্লের দুর্গে ডানা মেলে ওড়ার এক অলৌকিক জগৎ, একাকী কুবেরের সঙ্গী রাত-জ্যোৎস্না, নদীর জল আর গাছের ছায়া ইত্যাদি আশ্রয় করে শ্যামলের আখ্যান সমস্যাসংকুল বাস্তব থেকে উত্তীর্ণ হতে থাকে প্রকৃতি থেকে অতিপ্রাকৃত জাদুর রহস্যময় কল্পনার হাতছানিতে। কিন্তু স্বপ্নের কারবারি কুবেরকে অর্থলিপ্সা ও অবৈধ লালসা গ্রাস করলে প্রকৃতি নিশ্চুপ থাকে না। মেদনমল্লের ধানক্ষেতে মড়ক লাগে। স্ত্রী-পুত্র-সংসার ছেড়ে অবৈধ সংসর্গে মত্ত কুবের তার বিষয়-আশয় ও স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতি স্বীকার করে ফিরে আসে কদমপুরে। চাঁদনি রাতে ফিরে যায় পুরনো মনুষ্যেতর বন্ধুদের কাছে, কথা বলে তরতর করে চলতে থাকা সাপের সঙ্গে, আবছা অন্ধকারে তাকে চিনতে পেরে লেজের চামর বুলিয়ে আদর করে মূলতানী গাইটি। স্ত্রী বুলুকে ছেড়ে আভাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া কুবের চিনতো খেঁজুর তলার বাঁ হাতে সাপের বাসা। তাই শিস দিয়ে ডেকে আলাপ জমাতে চেয়েছিলো তার সাথে। তাকে ডেকেছিলো খুব অনুনয় করে 'আভা, আভা' বলে। গর্ত থেকে বেরিয়ে 'আভা' নির্ভুল ছোবল দিয়েছিল কুবেরকে। পায়ে কষে বাঁধন দিয়ে ঝিমঝিম বিষঘোরে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে কুবের দেখ তে পায় সার সার তালগাছের কোলঘেঁষা এক বিরাট নীল চাঁদ। একটা মই লাগিয়ে ওপরে উঠতে থাকে চাঁদ ধরবে বলে। এভাবেই জাদুবাস্তবতার কুহক লাগে কেবল মৃত্যুপথযাত্রী কুবের নয়, লাগে পাঠকেরও চোখে;'মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা রেখে কুবের চাঁদ পেয়ে গেল। মাথার ওপরে হাওয়ায় ঝুপসি তাল পাতাসুদ্ধ কাঁটাতোলা ডালগুলো নড়ছে। নীচে তাকালেই মাঠভর্তি ধান, আধখানা দীঘি জুড়ে জ্যোৎস্নায় পদ্ম ফুটে আছে; সারি দিয়ে দাঁড়ানো পরীদের যে কেউ এক্ষুনি উড়ে যেতে পারে। [...] হাতের একটা আঙুল চাঁদের এক কোণে লাগাতেই ডেবে গেল। খুব সাবধানে আরেক কাঠি উঠে কুবের ডান হাতখানা চাঁদের ওপর চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কনুই অব্দি গেঁথে গেল। অনেক কষ্টে টাল সামলে নিলে কুবের। এতবড় একটা জিনিস। তার সবটা জুড়েই নীল মাখনের কোটিং। তার উপর দিয়ে নীলচে আলো গলে পড়ছে। এখান থেকেই জ্যোৎস্না হয়। [...] মাখনের নীচে ডান হাত দিয়ে কুবের চাঁদের গায়ের শক্ত কিছু ধরতে চাইল। চাঁদ বড় স্লিপারি।' এর পরবর্তীতে লেখা শ্যামলের 'হাওয়া গাড়ি' (১৯৭৯) ও 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০) উপন্যাস দুটিতে জাদুবাস্তবের কিছু স্পর্শচিহ্ন থাকলেও 'হিম পড়ে গেল' (১৯৮২) উপন্যাসটিতে পাই মাঝবয়সী মধ্যবিত্ত দেবকুমারের ভাবনায় একটা বছর থেকে বর্ষা

JOCAS
Journal of Commerce, Arts and Science
Volume: 4, Issue : 1, December 2021

হারিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা কিভাবে সংকটাপন্ন নায়ককে নিয়ে যায় বাস্তব পেরিয়ে জাদুবাস্তবতায় তার চমকপ্রদ আখ্যান। সাতচল্লিশ বছরের দেবকুমার একদিন বাজারে গিয়ে হিমে ভেজা বরবটি হাতে নিয়ে ভাবে হিম পড়ে গেল বর্ষা আসার আগেই? হিম পড়ে গেল আর মুছে গেলো একটা গোটা ঋতু? ঋতুচক্রের এহেন খেয়ালিপনায় দারুণ চিন্তাসংকটে পড়ে গেলো সে। ভাবতে ভাবতে কয়েকদিনের মধ্যে সে যেন বুড়ো হয়ে গেলো, সাতচল্লিশ উল্টে চুয়াত্তর। ছেলে-বউ দেবকুমারের পাকা চুল, কোঁচকানো চামড়া আর মুখ-চোখ দেখে ঘাবড়ে গেলো। অথচ আয়নায় দাঁড়ালে নিজের চোখে সে সেই সাতচল্লিশ। পথে-ঘাটে, কর্মস্থলে সবাই অবাক দৃষ্টিতে দেখে, তামাশা করে, আর চিন্তায় চিন্তায় দেবকুমার ক্রমে বাস্তব থেকে সরে যেতে থাকে স্বপ্ন ও অলৌকিকের দিকে, ফিরে যায় শৈশবের রূপকথার জগতে। বাস্তবের সমস্যা-সংঘাত থেকে সরে গিয়ে বিকল্প বাস্তবের এই উজ্জীবন জাদুবাস্তবতার প্রস্থানভূমি। এক রাতে তার ছোটবেলার দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী খুলে দেবকুমার দেখলো প্রিয় শিশুসাহিত্যিক সুকুমার দে সরকারের আত্মঘাতী হরিণের গল্প। এখন কোথায় সেই লেখক, কোথায় গেলো হরিণটি? ঘুমের মধ্যে তাকে দেখা দিলেন শৈশবের লেখক, ডাকলেন তার নাম ধরে, ছুটতে থাকলেন আর দেবু ছুটে গেলো তাঁর পেছনে। রবীন্দ্রসদনের সামনে কাশফুল, পাতাল-রেলের গর্তে বয়ে চলা নদী, পাশে জমানো মাটির পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গল্পের সেই হরিণ। সুকুমার দে সরকার ছুটলেন হরিণের দিকে। টাটা সেন্টারের সামনেটা ছেয়ে গেলো জঙ্গলে। হরিণ ঝাঁপ দিলো পাতাল রেলের নদীতে। লেখকের হাত থেকে পড়ে গেলো তাঁর প্রিয় 'রাজা' ফাউন্টেন পেন। ঘুম ভেঙে গেলো দেবুর। সেই থেকে দেবকুমারের মন জুড়ে থাকে সুকুমার দে সরকার আর তার হরিণের আশ্চর্য জগৎ, শৈশবের নস্টালজিয়া। বাস্তবের জটিলতা আর তার অকালে বুড়িয়ে যাওয়া নিয়ে মানুষের তির্যক মন্তব্য ও সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি থেকে একমাত্র সুকুমার দে সরকারই তাকে বাঁচাতে পারে। বাস্তবের সবকিছু ঝাপসা হয়ে তার চোখে ভাসে দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীর অতিপ্রাকৃত জগৎ। অফিসের পথে ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জে বাস থেকে নেমে লতাপাতায় ঢাকা উল্টোদিকের ফুটপাথে সে দেখতে পায় সুকুমার দে সরকার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কিভাবে হারিয়ে গেলো একটা গোটা বর্ষাঋতু, কেন সবাই তাকে চুয়াত্তর বয়সের বুড়ো বলে ভাবছে, কেন দিনরাত জেগে ও ঘুমিয়ে সুকুমার দে সরকারের মায়াবী জগতের ছবি দেখে সে? দেবকুমার ভাবে একজন ডাক্তারকে মন খুলে সব বলা দরকার। একদিন বাসস্টপের সাইনবোর্ড থেকে সে খোঁজ পায় ডা. কাবাসির। ডা. কাবাসির এক অন্ধকার গোপন চেম্বারে চিকিৎসা শুরু হয় দেবকুমারের। সেখানেই ডাক্তার কোনো এক সুকুমারদা'কে ওষুধ বানিয়ে দিতে বললে দেবু অবাক হয়ে যায় লেখক সুকুমার দে সরকারকে দেখে। সুকুমারদা'র হাতে ধরা দড়িতে একটা পোষা হরিণ। ডা. কাবাসি বলেন যে এটা সুকুমারদা'র তপোবন। এখানেই হুঁশ ফিরলে দেবকুমার দেখে সে দাঁড়িয়ে আছে মেট্রোর ভিড়ে। এরপর সে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ায় সেই সাইনবোর্ড, ডা. কাবাসির চেম্বার, সুকুমারদা'র তপোবন আর সেই হরিণ। সব কিছু এসেছিলো ম্যাজিক ইল্যুশনের মতো; এখন সব কিছু ভ্যানিশ। এইভাবে মানুষের যাপিত জীবন-বাস্তব থেকে দূরে এক কল্পবাস্তবের বাসিন্দা হয়ে ওঠে দেবকুমার। একদিন ছেলে রাজুকে নিয়ে ছাদে ওঠে পাখির মতো উড়ে যাবে বলে। স্ত্রী শেফালী এসে তাকে আটকায়। অতঃপর বাড়িছাড়া ও এলাকাছাড়া হতে হয় দেবকুমারকে। বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে বেরিয়ে পড়ে একা, সম্পূর্ণ স্বাধীন। চলতে চলতে সে ঢুকে পড়ে ফুরফুরে বাতাস বইতে থাকা শালবনে। সেখানেই ফের দেখা হয় ডা. কাবাসির সঙ্গে। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকেন ডা. কাবাসি, তাড়াতাড়ি ছুটে তাঁর কাছে চলে আসতে বলেন। ছুটে যেতে গিয়ে পড়ে যায় দেবকুমার। ঘোর কেটে গেলে দেবকুমার দেখে ডা. কাবাসি কোথাও নেই। চারপাশে শুধু শালগাছেরা হাওয়ায় দুলছে। সে আবার চলতে থাকে সুকুমার দে সরকার ও তার হরিণের সন্ধানে।

প্রায় একই সময়ে বাঙালি পাঠককে লাতিন আমেরিকার ম্যাজিক রিয়ালিজমের আস্বাদ এনে দিয়েছিলেন অভিজিৎ সেন তাঁর 'দেবাংশী' (১৯৮১), 'রহচণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫), 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' (১৯৯৫) ইত্যাদি লেখায়। গুয়াতেমালার লেখক মিগেল আস্তুরিয়াস তাঁর 'Men of Maize' (১৯৪৯) উপন্যাসে ঔপনিবেশিকতার প্রতিস্পর্ধায় ব্যবহার করেছিলেন প্রাচীন মাইয়া সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কিউবার ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ার তাঁর 'The Lost Step' (১৯৫৩) উপন্যাসে এক সঙ্গীতশিল্পীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রে করেছিলেন আপন আত্মানুসন্ধান। লাতিন আমেরিকার এ-জাতীয় রচনার ছায়াতেই অভিজিৎ সেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে লুপ্ত জীবন-সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন জাদুবাস্তবতার আঙ্গিকে। লোকাচার-নির্ভর গোষ্ঠী-সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিবেদন 'দেবাংশী' অভিজিৎ সেনের প্রথম জীবনের বালুরঘাট পর্বের আখ্যান। দেবতা যাদের ওপর ভর করে সেই দেবাংশীদের দেখেছিলেন লেখক, যারা ছিল গ্রামীণ কৌম সমাজে ভালোমন্দ নির্ধারণের নিয়ামক। অভিজিৎ-এর গল্পে লোহারা গ্রামের সারবান লোহার তেমনই এক দেবাংশী। কালী

বা মনসার থানে তার শরীরে দেবতা ভর করলে সারবানের কথা হয়ে যায় দৈববাণী। দেবাংশী সারবান হয়ে ওঠে নিম্নবর্গীয় অসহায় মানুষদের মুশকিল আসান। বহু বছর আগে বালক সারবানের পিতা হীরামন তার অসুস্থ স্ত্রীকে বাঁচাতে পাঁচ বিঘা জমি বাঁধা রেখে পঞ্চাশ টাকা ধার করেছিলো রঘুনাথের কাছ থেকে। স্ত্রী বাঁচে নি আর তাড়াতাড়ি ধার শোধ দিয়ে তার জমি ফিরে পেতে গিয়ে অতি পরিশ্রমে মারা গিয়েছিলো হীরামন। পিতৃঋণের বোঝা কাঁধে দশ বছরের সারবান রঘুনাথের বাড়িতে রাখালের কাজে যোগ দেয়। এরপরে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে খেরা খেলার থানে সে হয়ে ওঠে দেবাংশী। ক্রমে লোকবিশ্বাসে ভর করে দৈবী শক্তিতে অভ্যস্ত সারবান নিদান দিতে থাকে। অনেক বছর বাদে রোগমুক্তি ও সন্তান চাওয়ার মতো বিষয়ের বাইরে দেবাংশীকে বার করে আনে সেতু যখন সে তার জমির কোবলা ফেরতের ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হয় সারবানের কাছে। তার নিজের পঞ্চাশ বছর আগের অতীতে ফিরে যায় সারবান লোহার। এখান থেকেই গ্রামের প্রতিপত্তিশালী জমি-দখলদারদের অত্যাচারে পীড়িত মানুষদের মুক্তির লড়াইয়ে এক বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটে দেবাংশীর। গ্রামীণ ধর্মবিশ্বাসের ছক ভেঙে অত্যাচারিত মানুষদের শেষ অবলম্বন সারবান হয়ে ওঠে এক অন্য দেবাংশী। পশুদের নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ানো বাজিকরদের লুপ্ত জীবনের আখ্যান 'রহুচণ্ডালের হাড়'। বহুশত বছর ধরে মহাজনী শোষণ আর আইনী শাসনে শেকড়ছেঁড়া বাজিকরেরা তাদের যাযাবর জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও ধারণ করে রাখে পৌরাণিক স্মৃতি আর চিরন্তন সংস্কৃতি, যত্ন করে রাখে হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষ রহুর একটুকরো হাড়। প্রায় দেড়শ' বছরব্যাপী বিস্তৃত এক কল্পিত বাস্তবে অভিজিৎ লেখেন বাজিকরদের গোষ্ঠীজীবনের বিশ্বাস-প্রতিষ্ঠার কাহিনি। কাঁপা কাঁপা গলায় নাতি শারিবাকে গল্প বলে বাজিকর পরিবারের পঞ্চম পুরুষ জামিরের স্ত্রী বৃদ্ধা লুবিনি। বলে এক না-দেখা দেশের কথা, ঘর্ঘরা নদীর তীরে, ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিলো বাজিকরদের বাড়িঘর। তারপরে আবার চলতে থাকা, বসতি স্থাপন, বাঁদর-ভালুক জোগাড় করে খেলা দেখানো। ঘর্ঘরার উত্তরে গোয়ালপাড়ায় নতুন বসতির তিন দিনের মাথায় আবার উৎখাতের নোটিশ। রাতে ঘুমের মধ্যে জামিরের দাদু প্রীতেমকে স্বপ্নে দেখা দেয় তার মরা বাপ দনু, ছেলেকে দলবল নিয়ে পুবের দেশে যেতে বলে। স্বপ্নে দেখা মরা বাপের নির্দেশমতো প্রীতেম আর বাজিকরদের দল চলতে থাকে পুবের দিকে, জনপদ থেকে জনপদে। বাস্তবের দিশেহারা অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে স্বপ্ন-স্মৃতি-ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে বাজিকরদের এই চলাই যেন জাদুবাস্তবের গ্রন্থনা। হাজার বছরের এক চলমান পৌরাণিক স্মৃতি, আদিপুরুষ রহুর হাড়ের রক্ষাকবচ সেই গ্রন্থনার উদ্দীপক আধার। যুগ যুগ ধরে তাদের প্রাণের গভীরে সযত্ন-লালিত এই ঐতিহ্য বহিরাগত অপসংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রীতেম রোজ অস্থিরচিত্তে বসে ভাবে গভীর রাতে তাদের তাঁবুর বাইরে গাছতলায়। সেখানেই চাঁদনী রাতে দেখা দেয় দনু, বলে রহুর কথা। দূরে তাকিয়ে চাঁদের আলোয় প্রীতেম দেখে রহুর চলমান ছায়া। রহু সব বাজিকরদের এভাবেই দেখে। সে তার হাড় দিয়ে গিয়েছিলো বাজিকরদের এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে। দনু ছেলেকে শোনায় বাজিকরদের পিতৃপুরুষ রহু চণ্ডালের গল্প। বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে বাজিকরদের প্রাচীন ভূখণ্ড, শস্যক্ষেত, নদী, স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই ও সেই লড়াইয়ে রহুর আত্মবলিদানের গল্প। এই গল্প থেকে উদ্দীপনার রসদ সংগ্রহ করে প্রীতেমদের লড়াই পুবের শেষ ঠিকানায় বাজিকরদের অধিকার প্রতিষ্ঠার। অতঃপর ১৯৪৭-এর দেশভাগের কারণে বাজিকরদের সুস্থিত শেষ ঠিকানা জমিলাবাদ চলে যায় পাকিস্তানে। এতদিন তাদের কোনো ধর্মীয় পরিচয় ছিলো না। এখন রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের চাপে তারা বাধ্য হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে। তবে কি বাজিকরদের এই দীর্ঘ পরম্পরা আবারও আক্রান্ত ও ধ্বস্ত হবে? কিন্তু না, ভয় নেই, লুবিনি গাছের ছায়ায় দেখতে পায় রহুকে।

ঔপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশবাদী দমন-পীড়ন-শাসন-শোষণের বিরুদ্ধতায় জাদুবাস্তবতা একটি প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক ডিসকোর্স। অসহায় প্রান্তেকায়িত গ্রামীণ মানুষদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-উত্তরণে উদ্বুদ্ধ করতে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা লোকবিশ্বাস, মিথকথা, রূপকথা ও কল্পকাহিনি ইত্যাদির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটান। সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিক্ষেত্রের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ের নিরিখে দেখলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চেয়ে অভিজিৎ সেন অনেক বেশি পলিটিক্যাল। আবার অভিজিৎকে হয়তো বা ছাপিয়ে গেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৮৭) উপন্যাসে। উপন্যাসের ভূমিকায় মহাশ্বেতা যা বলেছিলেন তাতেই জাদুবাস্তবতার রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধার পরিসরটি চিহ্নিত হয়েছিলো; 'এই উপন্যাসে আমি ভারতবর্ষে আদিবাসী জনজাতির বিপন্নতার কথা বোঝাতে চেয়েছি। সেজন্যেই টেরোড্যাকটিলের মিথিক্যাল প্রবেশ ও প্রস্থান আমার কাছে দরকার ছিল। [..] মেসোজোয়িক যুগের টেরোড্যাকটিল যদি আজ হাজির হতো, আজকের মানুষ তাকে বুঝতে সক্ষম হতো না। টেরোড্যাকটিলকে মরতেই হতো, কেননা কেনোজোয়িক পৃথিবী তার অজ্ঞাত। তেমনি আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, সভ্যতা সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে শোভিত এক মহাদেশ। আমরা

JOCAS
Journal of Commerce, Arts and Science
Volume: 4, Issue : 1, December 2021

মূল স্রোতের মানুষরা, সে মহাদেশকে জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি।' মার্কেজের 'মাকোন্দো'র মতো 'পিরথা' এ-উপন্যাসে এক কল্পিত স্থাননাম, যার অস্তিত্ব নেই ভারতের মানচিত্রে। নিজভূমে পরবাসী লুপ্তপ্রায় বঞ্চিত আদিবাসীদের এক আশ্রয় এই 'পিরথা' ব্লক। সেখানে আসে সাংবাদিক পূরণ সহায় আদিবাসী জীবনের শোষণ-বঞ্চনার ছবি সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে। আশি হাজার নাগেসিয়া আদিবাসী বহুদিন ধরে মরছে অনাহারে অথচ সরকার 'দুর্ভিক্ষ এলাকা' ঘোষণা করছে না আর তাই কোনো বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার ও স্বার্থান্বেষী শক্তি তো চায় আদিবাসীদের উৎখাত করে ওখানে মুনাফাজনক পিকনিক স্পট গড়তে। আদিবাসীদের এই বিপন্ন জীবন ও সংস্কৃতির সংকট বোঝাতে মহাশ্বেতা ব্যবহার করলেন মেসোজোয়িক যুগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে মুখ থুবড়ে পড়া এক বিলুপ্ত জন্তুর প্রতীক। জরিপের ম্যাপে 'পিরথা' ব্লকটিকে তেমনই দেখতে। এক অবলুপ্ত বাস্তবতার প্রতীকে মহাশ্বেতা তুলে ধরতে চাইলেন অবলুপ্তির পথে চলা আদিবাসী জীবনের বাস্তবতা। জাদুবাস্তবের অলৌকিক রহস্য আরও বিস্তার পেলো চাঁদনী রাতে পাখির মতো উড়তে উড়তে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে যাওয়া এক অশুভ ছায়ার আবির্ভাবে। যৌথ জীবনে পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকা আদিবাসীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সঙ্ঘবদ্ধ করতে নিয়ে আসা হলো পূর্বপুরুষদের অশরীরী আত্মার উড়ন্ত ছায়া। পূর্বপুরুষদের অতৃপ্ত অশরীরী আত্মার এই ঐন্দ্রজালিকতা শাসকের দীর্ঘ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্দীপিত করলো আদিবাসীদের। সাংবাদিক পূরণ নিজেও এক আদিবাসী এবং এখন সে আদিবাসীদের সহায়। পূরণ আসতে বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে, ক্রমে বৃষ্টির এক প্রতীকায়িত আবহে আদিবাসীদের পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রবেশ করে পূরণের ঘরে, ঘোর লেগে যায় পূরণের। সে পড়তে থাকে মেসোজোয়িক যুগের উড়ন্ত সরীসৃপ টেরোড্যাকটিলের বৃত্তান্ত। সেই টেরোড্যাকটিল যেন ফিরে এসেছে বৃষ্টির অন্ধকারে এক আশ্চর্য প্রাণীর রূপে। টেরোড্যাকটিলের মতো অবলুপ্তির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এখান থেকেই শুরু হয়ে যায় পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী পিরথার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের প্রস্তুতি। জাদুবাস্তবতার প্রকরণে সাব-অলটার্ন সমাজের রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধার আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মহাশ্বেতার 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' (১৯৮২)। উপজাতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক নায়কোচিত চোট্টির জাদুতিরের কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে লোকশ্রুতি-অতিকথা-ইতিহাসের ঐন্দ্রজালিকতায় মুণ্ডা সমাজের উত্থান-পতন, সমস্যা-সংকট-বিদ্রোহের এক মহাকাব্যধর্মী আখ্যান। চোট্টির জাদুতির মুণ্ডাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংবাহিত এক উত্তরাধিকার, নিম্নবর্গীয় মানুষদের বঞ্চনা-সংগ্রাম-প্রতিরোধের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তে এক প্রবহমান সঞ্জীবনী। উপজাতি সমাজকে সংগঠিত করতে চোট্টির জাদুতিরের কিংবদন্তি এক অমোঘ মন্ত্রশক্তি। জনশ্রুতি, না-লেখা ইতিহাস, স্বপ্ন ও সংগ্রামের বহুস্তর আখ্যানে মহাশ্বেতা নির্মাণ করেছিলেন জাদুবাস্তবের পরিসর।

ষাটের শেষে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কুবের সাধুখাঁ থেকে পরবর্তী কুড়ি বছরে মহাশ্বেতার টেরোড্যাকটিল, পূরণ আর চোট্টি মুণ্ডার আখ্যানে বাংলা ভাষায় জাদুবাস্তবের প্রকরণ এক সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। এই কুহক আঙ্গিকের পতাকা উড়িয়ে এসে পড়ছিলেন আরও অনেক ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। উল্লেখ করা যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮) যা কিনা লোকবাস্তবতা ও অলৌকিকত্বের টানাপড়েনের এক সমাজবিজ্ঞানীসুলভ পর্যবেক্ষণ। মার্কেজের বইয়ের মতো এক পীর পরিবারের একশ' বছরের গল্প। লৌকিকতার আবরণে অলৌকিকের সাধনা করতে করতে কিভাবে একজন মানুষ হয়ে যায় অলীক তারই এক ফ্ল্যাশব্যাক ন্যারেটিভ। সিরাজ জাদুবাস্তবের রহস্যময়তাকে এখানে ব্যবহার করেছিলেন ধর্মীয় কপটতার মুখোশ খুলে দিতে, অভিজিৎ-মহাশ্বেতা বা লাতিন আমেরিকার লেখকদের মতো কোনো ইতিবাচক উত্তরণমুখী প্রতিস্পর্ধার মতো করে নয়। এছাড়াও আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পরিসরে জাদুবাস্তবতার বয়ান হিসেবে দেখা যেতে পারে আবুল বাশারের 'মরুস্বর্গ' (১৯৯১)। খ্রিস্টজন্মেরও বহু পূর্বেকার প্রাচীন পৃথিবীর এক ভূখণ্ডে একদিকে ভূমিহীন মরুযাযাবর জনগোষ্ঠী আর অন্যদিকে শস্যশ্যামল ভূমিক্ষেত্রের কৃষিজীবী মানুষদের দ্বান্দ্বিকতার আখ্যান এখানে উপস্থাপিত হয়েছে পুরাণ, লোকগাথা, কিংবদন্তি, উপকথার ঐতিহ্য অনুসারী জাদুবাস্তবতার আধারে।

তাঁর নোবেল ভাষণে মার্কেজ বলেছিলেন যে মানুষের জীবনকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে লিখতে গেলে প্রচলিত কথনকৌশল যথেষ্ট নয়। গড়ে তুলতে হয় এক বিকল্প, হয়তো বা, বিরুদ্ধ কল্পরাজ্য। বাস্তবতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে হাত ধরতে হয় অনেক অতি/পরা-বাস্তবতার। এসে পড়ে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক, জাদু, অতিকথা, লোকগাথা, রূপকথা, অন্ধবিশ্বাস এবং আরও নানা অদ্ভুতুড়ে ভাবনা। ঝাপসা হয়ে যায় বাস্তব আর কল্পনার যুক্তিনিষ্ঠ সীমারেখা। ফুটে ওঠে, আলেহ কার্পেন্তিয়ার যাকে

বলেছিলেন 'marvelous real', যা কিনা আর্থ-সামাজিক তথা ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাবতীয় শোষণ-বঞ্চনা-বিরূপতার মোকাবিলায় হয়ে ওঠে প্রান্তেকায়িত মানুষের আয়ুধ। এই সার্বিক প্রেক্ষিতেই একালের বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে জাদুবাস্তবতার বহুমাত্রিকতার সন্ধানে আরও অনেকের রচনা বিশেষ উল্লেখ ও আলোচনার দাবি রাখে। মনে পড়ছে উত্তর-ঔপনিবেশিক/ উত্তর-আধুনিকতাবাদী আখ্যান-নির্মানের ধারায় হাংরিয়ালিস্ট লেখক মলয় রায়চৌধুরীর 'ছোটলোকের ছোটবেলা', 'এই অধম ওই অধম' ও 'নখদন্ত'। আধুনিকতার আভঁ গার্দ লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথনশৈলিতে স্মৃতি-ইতিহাস-ফ্যানটাসির প্রয়োগসূত্রগুলি নিয়ে এ-প্রসঙ্গে ভাবা যেতেই পারে তাঁর 'হিরোসিমা মাই লাভ' ও 'সোনালী ডানার ঈগল'-এর মতো আখ্যানের প্রকরণ-চিন্তায়।

সুন্দরবনের জল-জঙ্গল আর বনবিবি-দক্ষিণরায়ের গল্প আশ্রয় করে লেখা বেশ কয়েকটি উপন্যাসের কথাও মনে করা যেতে পারে — সমীর রক্ষিতের 'দুখের আখ্যান', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির', অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' এবং সোহারাব হোসেনের 'গাঙবাঘিনি'। লৌকিক-অলৌকিক, স্বপ্ন-কল্পনা, বাস্তব-পরাবাস্তব, অতীত-বর্তমান সবকিছুর মিশ্রণ ও ঘূর্ণনে, এক আশ্চর্য চিত্রকল্পময় ভাষার কুহকবিন্যাসে রচিত হয়েছে বহুস্তর প্রতিস্পর্ধী ডিসকোর্স। এছাড়াও মনে করা যেতে পারে কিন্নর রায়ের 'স্বপ্নপুরাণ', 'ধূলিচন্দন' ও 'ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর'। 'স্বপ্নপুরাণ'-এ সাম্প্রদায়িকতার সংকটের ভাষ্যে ওসামা বিন লাদেন পুকুরপাড়ে এসে ডাক দেয় জেহাদের, বুনো বেড়াল হয়ে যায় উকিল, আবির্ভাব ঘটে বোমাবৃক্ষের। 'ধূলিচন্দন'-এ দেখি বুনো হাতিরা কথা বলে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা নকশালদের সঙ্গে; আর দেখি রূপকথার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, ডানাওয়ালা সাপ। 'ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর'-এ এক উন্মাদ ঈশ্বরের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, বার্লিন থেকে কলকাতা। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমাদের কঠোর ও কঠিন বাস্তবকেই দেখতে ও দেখাতে চাইছেন লেখক অতিক্রমী কল্পনা আর অ-বাস্তবের মোড়কে। বেশ কিছু বাংলা ছোটগল্পেও জাদুবাস্তবতার মনন ও আঙ্গিক নানাভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'নকশি কাঁথার মাঠ' এবং সোহারাব হোসেনের 'মাঠপরী'। সিরাজের গল্পে গ্রামের পরিত্যক্ত জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি কথা বলে, বলে 'মর্ মর্', আর মরে যায় তার তলায় পাতা কুড়োতে যাওয়া বুড়ি, তার গুঁড়িতে লাথি মারতে থাকা এক নেশাখোর প্রৌঢ়, এক চোর, দারোগাবাবু আর প্রেমে প্রত্যাখাত এক ডাক্তার। স্বপ্নময়ের গল্পটিতে জসীমউদ্দিনের কাব্যগ্রন্থের স্মৃতি উসকে দেয় জগার বউ মতির বাহারি নকশি কাঁথা, তার দিদিশাশুড়ির তৈরি, যেটি মতি দারিদ্রের কারণে বেচে দেয় শহুরে বাবুদের প্রদর্শনীর জন্য। এরপরে একদিন চাল বেচতে গিয়ে পুলিশের খপ্পরে পড়ে মতি। নিজের ভেতরে আশা-নিরাশায় আক্রান্ত হতে হতে মতির মনে হয় দক্ষতনয়া সতীর কথা যার দেহত্যাগে একদা লণ্ডভণ্ড হয়েছিলো গোটা বিশ্ব। সেও কি পারে না সেভাবেই দুনিয়ার সব শোষক-পীড়ককে ধ্বংস করতে? নকশি কাঁথার মতো মতির শরীরের মধ্যে বোনা কামনা-বাসনা-স্বপ্ন সব আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে, জ্বলতে জ্বলতে সেই আগুন ছড়িয়ে যায় ঘরে ঘরে। সোহারাবের গল্পে কওছর আর তার বিবি সাবেরা মাঠে চাষ করে। মাঝরাতে তাদের জমিতে ছায়া ফেলা বড়ো চাষিদের আমগাছ কেটে দেয় সাবেরা। সবাই ভাবে এ-কাজ মাঠপরীর। জমি-অন্তঃপ্রাণ প্রান্তিক কৃষিজীবীদের জমিরক্ষার লড়াইয়ে মাঠপরীর সংস্কার জাদুর ছোঁয়া আনে বাস্তবতায়।

বাংলাদেশের অগ্রগণ্য লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' উপন্যাস দু'টি জাদু-বাস্তবতার আলোচনায় বিশেষভাবে স্বীকার্য। যদিও ইলিয়াস নিজে সরাসরি এ-দু'টি রচনাকে জাদুবাস্তবতার দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন নি, তবু মার্কেজ তথা লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঋণ তিনি সর্বদা স্বীকার করেছেন। ইলিয়াসের লেখায় লোকজীবন ও সংস্কৃতি, স্বপ্ন ও স্মৃতির কুহকে রাজনৈতিক বাস্তবতার বয়ান পাঠককে অবশ্যই 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর'-এর লেখকের কথা মনে করিয়ে দেবে। ১৯৬৯-এর অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা 'চিলেকোঠার সেপাই' স্বপ্ন-স্মৃতি-ইতিহাস-ফ্যানটাসির মায়াজালে ধৃত রাজনৈতিক উপন্যাস। কবর থেকে উঠে আসা মরা মা, বটগাছের মাথা থেকে উড়ে যাওয়া জিন, একই নামের একাধিক মানুষ, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে আর বর্তমান থেকে অতীতে যাতায়াত, এসবই মার্কেজীয় আঙ্গিককে চিনিয়ে দেয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০-এর কালপর্বে ঐতিহাসিক স্বপ্নভঙ্গের দলিল 'খোয়াবনামা'। লোকজীবন ও সংস্কৃতির আবহে রাজনৈতিক বার্তা তুলে ধরেছেন ইলিয়াস। ফ্যানটাসির মাত্রা এ-উপন্যাসে কিছু বেশি। ঘুমন্ত মানুষ কথা বলে মৃত মানুষ, জিন-পরীদের সাথে। রয়েছে গান, মেলা, শোলোকের মতো অনেক লোক-উপাদান। আছে মার্কেজের বইতে পাওয়া বহুযুগের পরম্পরা-বাহিত পুঁথির প্রসঙ্গ। ইলিয়াসের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে শহীদুল জহিরের প্রথম উপন্যাস, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'।

সীমায়িত পরিসরের এই পর্যালোচনায় বাংলা সাহিত্যে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতিস্পর্ধা ও বিকল্প বাস্তবের ঐন্দ্রজালিকতার রাজনৈতিক ডিসকোর্সের অনুসন্ধান শেষ করবো নবারুণ

JOCAS
Journal of Commerce, Arts and Science
Volume: 4, Issue : 1, December 2021

ভট্টাচার্যের কথা স্মরণ করে। প্রেত ও পরলোকচর্চা, বাস্তব ও পরাবাস্তব, অদ্ভুতুড়ে কৌতুক ও কার্নিভ্যালের হুল্লোড়, এসবের চমকপ্রদ বয়নে কুহক বাস্তবতার বয়ান নবারুণের লেখায় হয়ে উঠেছিলো বিস্ফোরণের কথনশিল্প। 'হারবার্ট'-এ এক অবহেলিত যুবকের হতভাগ্য বাস্তব বেঁচে ছিলো ভূত-প্রেত-পরলোক চর্চায়। হারবার্ট সরকারের রহস্যময় ও কৌতুকপ্রদ কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধার নানা প্রসঙ্গ। উপন্যাসের শেষে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণে মৃত মানুষদের প্রেতের মতোই যেন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মৃত নকশালপন্থী প্রতিস্পর্ধার প্রেত। নবারুণের গল্পে সাব-অলটার্নদের প্রতিনিধি ফ্যাতাড়ু ও চোক্তাররা এক গ্রোটেস্ক কৌতুকে খেলা করে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে। 'ফ্যাতাড়ু' সিরিজ আর 'কাঙাল মালসাট'-এ সামাজিক কেচ্ছা-কেলেংকারি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে নবারুণ দেখান বিকল্প বাস্তবের আগ্রাসন। যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতিস্পর্ধা ও বিকল্প বাস্তবের রাজনৈতিক ডিসকোর্সের অভিমুখ বদলে যায় 'মসোলিয়ম'-এ। লেনিনের আদর্শ ভুলে তাঁর মরদেহের মমি আঁকড়ে থাকার অভ্যাসকে ব্যঙ্গ করে নবারুণ লিখলেন ভণিতা, চাতুরি, লুঠতরাজের বঙ্গ-সংস্কৃতির উন্মোচনে এক বাখতিন-ঘনিষ্ঠ প্রতিস্পর্ধী আখ্যান। নবারুণের বিকল্প বাস্তবের প্রতিস্পর্ধা আর এক বিস্ফোরক মাত্রা পায় 'বেবি কে' উপন্যাসে। পেট্রল দিয়ে আগুন নেভানোর প্রকল্পনায় নবারুণ পেট্রলজীবী বেশ্যা বেবি কে- কে করে তোলেন এক পূর্ণাবয়ব মলোটভ ককটেল। এক কল্পনগরীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বিষাক্ত পরিবেশে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চক্রান্তের প্রতিস্পর্ধায় নবারুণ বিকল্প বাস্তবের অনুসন্ধান করেছিলেন 'খেলনানগর'-এ। নবারুণের বাস্তব-অতিক্রমী বিকল্পের অনুসন্ধান এক চমকপ্রদ মাত্রা পেলো তাঁর কুকুর-উপকথা 'লুব্ধক'-এ। কলকাতা শহরের পথ-কুকুরেরা শহরবাসী মানুষদের স্বেচ্ছাচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিশোধে চালিত হয় মিশরীয় উপকথার অতিকায় কুকুরদেবতা অনুবিসের নেতৃত্বে। শহর ছেড়ে চলে যেতে যেতে মহাকাশ থেকে ছুটে আসা গ্রহাণুর হাতে প্রতিস্পর্ধী পথ-কুকুরেরা সমর্পণ করে কলকাতাকে। এক অনিবার্য বিস্ফোরণের কাউন্ট-ডাউন চলতে থাকে। এই আখ্যানেই নবারুণ ব্যবহার করেছিলেন 'জাদু-বাস্তব' অভিধাটি। শুধু ব্যবহারই করেন নি, আলোকিত করেছেন বহু-আলোচিত এই অতিক্রমী বিকল্প বাস্তবের অন্তঃসার—'সেই পচা কাদাজলের মধ্যে পৃথিবীর প্রাণশক্তি ছিল। সিক্ত, শীতল আরাম ছিল। অবশ করে দেওয়ার কুহক মন্ত্র ছিল। সর্বোপরি আশ্রয় দেওয়ার একটি কোল ছিল। [..] এরপর লোম-ওঠা, কান-গলা, খোবলানো জায়গাটা দেখতে এমনই হয়ে উঠেছিল যে তার প্রতি যে-পুরুষ-কুকুরদের টান, তারাও তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু নানা মাত্রার প্রাণের অন্তর্বিষ্ট ক্ষমতা এক জাদু-বাস্তব।'

সহায়ক গ্রন্থ/পত্র-পত্রিকা

১. Alejo Carpentier, 'On the Marvelous Real in America', 1949, https://www.graduateschools.uni-wuerzburg.defileadmin/43030300/Heise-Materialien/carpentier-marvelous_real.pdf

২. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, J. A. Cuddon, Penguin, 1999

৩. Magic (al) Realism, Maggie Ann Bowers, Routledge, 2005

৪. Politics of the Possible, Kumkum Sangari, https://www.jstor.org/stable/1354154

৫. গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবিতীর্থ, ২০১৬

৬. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব', প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৩

৭. ম্যাজিক রিয়ালিজম ও বাংলা সাহিত্য, পলাশ খাটুয়া সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬